স্বরপুর' থেকে 'আমিনপুর' : একটি নিবিড় বীক্ষণ

দিলীপ সাহা

নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনির মাধ্যমে অর্থনৈতিক শোষণের সামগ্রিক চিত্র স্পষ্টভাবে প্রতিভাত করতে দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩) স্বরপুর গ্রামের দুটি পরিবারের আখ্যান উপস্থাপিত করেছেন 'নীলদর্পণ' নাটকে—গোলোকচন্দ্র বসুর পরিবার ও প্রতিবেশী সম্পন্ন রায়ত সাধুচরণ ঘোষের পরিবার। দুটি পরিবারই নীলকরদের নৃশংস পীড়নের শিকার। নাটকের শেষে গোলোক বসুর কনিষ্ঠ পুত্র বিন্দুমাধবের পরিতাপ ও আর্তনাদ তাই যথার্থ, 'স্বরপুরনিবাসী বসুকুল নীলকীর্তিনাশায় বিলুপ্ত হইল—আহা! নীলকরের কি করাল্ কর!' এহেন হাহাকার গণমানুষের চেতনায় শুধু ঘৃণাই জাগায় না, উন্মোচিত করে প্রচণ্ড দহন জ্বালার উৎসমুখও। এ আর্তনাদ স্বরপুর গ্রামের সর্বনাশেরই নয়, নিরুপায় বসু ও ঘোষ পরিবারের আত্মসমর্পণের গ্লানি নয়, ক্ষেত্রমণির লাঞ্ছনা ও মৃত্যুকে অতিক্রম করে প্রতিশোধ স্পৃহায় সমকালীন কৃষকশ্রেণির বিদ্রোহের গর্জনে স্পন্দিত। প্রায় প্রত্যেক নাট্যচরিত্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বর্বর শোষণে নিপীড়নের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে এবং বাঁচার পথ খুঁজেছে। বিশেষত উল্লেখ্য, প্রবল রাষ্ট্রশক্তি রোগ সাহেবের গালে চপেটাঘাত ও প্রচণ্ড প্রহার (তৃতীয় অঙ্ক তৃতীয় গর্ভাঙ্ক) এবং বড়োসাহেব উডের নাসিকাচ্ছেদনে (পঞ্চম অঙ্ক দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক) তোরাপের বলিষ্ঠ অভিব্যক্তির মধ্যে নিহিত রয়েছে নীলকরদের শোষণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে শ্রেণিসংগ্রামের বিদ্রোহী চেতনা। সার্থকতার বিচারে অবশ্য এই নাটক সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন নয়। এ-কথা মনে রেখেও বলা যায়, সমকালিক প্রায়-সমস্ত সামাজিক নাটক থেকে এ-নাটক স্বাতন্ত্র্যে বিশিষ্ট। কারণ উৎপীড়িত কৃষক প্রজারই শুধু নয়, লাঞ্ছিতা নারীরাও ঘটনার প্রেক্ষিতে প্রতিবাদে রুখে দাঁড়িয়েছে। আর এ-ভাবেই সংগঠন ব্যতিরেকে দানা বেঁধেছে একটা সার্বিক প্রতিরোধের সংবিদিত রূপ। তাই 'মৃত্যু-র ঘনঘটা'-য় নাটকের ভয়ংকর শেষ অঙ্কের যবনিকা পতন ঘটলেও সবকিছু ছাপিয়ে কিন্তু এর পশ্চাদভূমি মুখর করে তুলেছে যে 'বহুর অত্যাচারিত বিপর্যস্ত জীবনার্তি' সেকথা বলাই বাহুল্য। বিশেষত শোষক নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে নিগৃহীত নবীনমাধব ও তোরাপের সংগ্রামী ঐক্য নাটকটিকে দান করেছে ভিন্ন মাত্রা, বিশেষ মর্যাদা, যার তাৎপর্য অপরিসীম। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য, লক্ষ্ণৌতে এই নাটকটির অভিনয়কালে ইংরেজ দর্শকবৃন্দের মঞ্চে লাফিয়ে উঠে অভিনেতাদের আক্রমণের ঘটনা। সর্বোপরি আমাদের মনে রাখতে হবে, সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে আক্রমণের মধ্য দিয়েই কলকাতার বুকে প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় বা ন্যাশনাল থিয়েটারের আত্মপ্রকাশ ১৮৭২ সালের ৭ ডিসেম্বর। এবং সেই থিয়েটারে প্রথম অভিনীত নাটক দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ'।

অপরদিকে আমিনপুর গ্রামের দারিদ্র্যপীড়িত কৃষক জনগণের অশেষ দুর্গতি, অনাহার আর মৃত্যুর বিভীষিকার মধ্যেও প্রতিরোধের প্রতিজ্ঞা 'নবান্ন' নাটকের সারবস্তু। মূলত আকাল ও মন্বন্তরের বিরুদ্ধেই উচ্চারিত এই প্রতিরোধের অঙ্গীকার। মরণকে জয় করে বাঁচার জন্য আপসহীন সংকল্প। আমরা জানি, মন্বন্তর সমাজব্যবস্থারই অনিবার্য পরিণতি, নিষ্ঠুর শোষণের, কূট রাজনীতির অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি। একদিকে বুর্জোয়া নাগরিক সভ্যতার প্রত্যক্ষ শত্রু মজুতদার, মুনাফাখোর, চোরাকারবারি, মহাজন, দালাল, বণিক ও সামন্তশ্রেণি, অন্যদিকে তাদের নির্মম শ্রেণিস্বার্থের অসহায় বলি গ্রামের মাঝারি কৃষক ও গরিব কৃষকের ভাঙনদশা—যারা রিক্ত, অপমানিত, সর্বস্বহারা, অত্যাচারিত। কৃত্রিম খাদ্যাভাব সৃষ্টি করে দুর্ভিক্ষের প্রস্তুতি অবশ্য শুরু হয়ে গিয়েছিল আগেই, তার নিদর্শন বিধৃত 'আগুন' একাঙ্ক নাটকের 'কিউয়ে'। চারটি দৃশ্য জুড়ে দ্বিতীয় একাঙ্ক 'জবানবন্দী' নাটকে দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ আবহ। ওই মন্বন্তর ঐতিহাসিক ব্যাপ্তি লাভ করে পূর্ণাঙ্গ নাটক 'নবান্ন'-এ। বিদেশি শাসকের বিরুদ্ধে বিয়াল্লিশের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, মন্বন্তর, চালের কালোবাজারি, দুর্ভিক্ষ-কবলিত গ্রামের সর্বহারা দরিদ্র মানুষ ও অসহায় কৃষকজনের শহরের ফুটপাতে উদ্বাস্তু হয়ে দিনযাপন, শহরের সংবাদপত্রে এইসব ভিখারিদের মর্মন্তুদ ছবি ছাপা, তারই মধ্যে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ, শেষে অনেক মূল্যের বিনিময়ে আবার গাঁয়ে ফেরা, একসঙ্গে গাঁতায় খাটার শপথ এবং পরিণামে প্রতিরোধের সংগ্রামী ঐক্যে নবান্ন উৎসবে উত্তরণ : 'মরিনি তো আমরা সবাই মন্বন্তরে।... জোর প্রতিরোধ। জোর প্রতিরোধ'। কাজেই 'নবান্ন' শুধু আমিনপুরের ছিন্নমূল কৃষক জীবনের আর্তনাদ মাত্র নয়, ভবিষ্যৎ মন্বন্তরের বিরুদ্ধে নবীন প্রাণের জাগরমন্ত্রও। এ-নাটকে বাচনভঙ্গি ও অভিনয় পদ্ধতি শিক্ষার দায়িত্বে ছিলেন নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য। সম্পাদনা, নির্দেশনাসহ যাবতীয় প্রয়োগ-শিল্পের পরিকল্পনায় শম্ভু মিত্র। এই সূত্রে মঞ্চে চটের মাধ্যমে অভিনব দৃশ্যপট ব্যবহারের আইডিয়ার নেপথ্যে মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের নামটিও প্রসঙ্গত এসে পড়ে। অবশেষে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রযোজনায়, শম্ভু মিত্র ও বিজন ভট্টাচার্যের যুগ্ম পরিচালনায় 'নবান্ন' প্রথম মঞ্চস্থ হয় শ্রীরঙ্গম রঙ্গমঞ্চে, ১৯৪৪ সালের ২৪ অক্টোবর। প্রথম অভিনয় রজনীর পর মানুষের মুখে মুখে ফিরতে থাকে নতুন নাটক 'নবান্ন'-র বলিষ্ঠ প্রযোজনার কথা। ক্রমে প্রতিক্রিয়ার ঢেউ আছড়ে পড়তে থাকে। প্রচল নাট্যরীতি পরিহার করে 'নবান্ন' নাটক জুড়ে যেন এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, রঙ্গমঞ্চের ইতিবৃত্তে সে-এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা। ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার পরিবর্তে অভিনয় কলার সমবেত প্রয়াসে (টিমওয়ার্কে) অভিনবত্ব আর মঞ্চসজ্জায় এল বাস্তবতা তথা জীবনমুখিনতা। সর্বোপরি গ্রামের অবহেলিত জনগণ নায়কত্ব অর্জন করল গণনাট্যের। কাজেই একাকিত্বের অবস্থান নয়, হিন্দু-মুসলমান কৃষকের সমবেত প্রয়াসে উদ্‌গীত নবান্ন উৎসবের গান এবং সংগ্রামী গণচেতনার উত্তরণই 'নবান্ন'-র যাবতীয় অভিকর্ষের মূলে।

ঢাকা থেকে ১৮৬০ সালে 'নীলদর্পণ' (পাঁচটি অঙ্ক, আঠেরোটি গর্ভাঙ্কে রচিত) যখন মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়, তখন নাট্যকারের নামের পরিবর্তে লেখা ছিল 'নীলকর-বিষধর-দংশন-কাতর-প্রজানিকর-ক্ষেমঙ্করেণ কেনচিৎ পথিকেনাভি প্রণীতম্'। অচিরেই সে-পথিকের নাম মানুষ জেনেছিলেন, দীনবন্ধু মিত্র এর প্রণেতা। তিনি ছিলেন সরকারি চাকুরে। ইন্‌স্পেকটিং পোস্টমাস্টার হিসেবে কার্যোপলক্ষে তাঁকে যেতে হত নানাস্থানে—ঢাকা, উড়িষ্যা, উত্তর-পশ্চিম দার্জিলিং, কাছাড়-এ। বাংলার সমাজ সম্পর্কে বহুদর্শিতাহেতু সকলের সঙ্গে তিনি অনায়াসে মিশতে পারতেন। এই সামাজিক অভিজ্ঞতার দরুন বহু স্থানের প্রাদেশিক ভাষা তিনি বলতে ও লিখতে পারতেন নিখুঁতভাবে। এর সঙ্গে মিশেছিল সর্বব্যাপী সহানুভূতি। এই দুটি গুণ সর্বোপরি তাঁর সহজাত রসবোধ এবং অনুভূত বিষয়কে আত্মীকরণ করার শক্তি ছিল শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের উপযুক্ত। তারই প্রতিফলন 'নীলদর্পণ'-এ। একথা সত্য, 'যাহা সূক্ষ্ম, কোমল, মধুর, অকৃত্রিম, করুণ, প্রশান্ত' সে-বিষয়ে দীনবন্ধুর অধিকার ছিল সীমাবদ্ধ। কিন্তু 'যাহা স্থূল, অসঙ্গত, অসংলগ্ন, বিপর্যস্ত' তা তাঁর 'ইঙ্গিত মাত্রেরও অধীন'। সাধুচরণ, রাইচরণ, ক্ষেত্রমণি, আদুরী, পদী ময়রাণী, গোপীনাথ, আমিন, তোরাপ চরিত্র সৃষ্টিতে উচ্চ ভাবকল্পনা নেই। 'চাষার বুদ্ধি, চাষার প্রাণ ও চাষার ভাষা' এখানে উৎকৃষ্ট নাট্যরসের উপাদান হয়েছে। নাট্যকার দীনবন্ধু সহানুভূতি শক্তির গুণে পল্লিজীবনের দৈন্য ও দুর্দশা, ক্ষুদ্রতা ও হীনতার গহনলোকে প্রবেশ করে, আসল মানুষের মহিমান্বিত রূপটিকে যথাসঙ্গত ও পূর্ণাঙ্গ করেই প্রতিভাসিত করেছেন। তোরাপের রাগ, আদুরীর তামাসা বা নিমচাঁদের মাতলামি কোনো কিছুই বাদ দেননি বলেই তো আমরা 'একটা আস্ত তোরাপ, আস্ত নিমচাঁদ, আস্ত আদুরী' পেয়েছি। 'রুচির দোষ' দেখতে গেলে বা 'রুচির মুখ' রাখতে গেলে আমরা পেতাম 'ছেঁড়া তোরাপ, কাটা আদুরী, ভাঙ্গা নিমচাঁদ'। কাজেই বিস্ময়কর সামাজিক অভিজ্ঞতা ও তীব্র সহানুভূতির ফলেই দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নাটক প্রণয়ন। দীনবন্ধু মিত্র তাঁর মুল উদ্দেশ্যটি নাটকের ভূমিকায় স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছিলেন :

'নীলকরনিকরকরে নীলদর্পণ অর্পণ করিলাম। এক্ষণে তাঁহারা নিজ ২ মুখ সন্দর্শনপূর্বক তাঁহাদিগের ললাটে বিরাজমান স্বার্থপরতা-কলঙ্ক-তিলক বিমোচন করিয়া তৎপরিবর্তে পরোপকার-শ্বেতচন্দন ধারণ করুন, তাহা হইলেই আমার পরিশ্রমের সাফল্য, নিরাশ্রয় প্রজাব্রজের মঙ্গল এবং বিলাতের মুখ রক্ষা।'[১]

অর্থাৎ নীলকর সাহেবদের নৃশংস অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তিলাভ করে 'প্রজাবৃন্দের সুখ-সূর্যোদয়' হোক—এটাই ছিল দীনবন্ধুর নাটক লেখার প্রধান অভিপ্রায়। নীলচাষ করতে গিয়ে বাংলার কৃষক সমাজ ইংরেজ নীলকরদের অসহনীয় শোষণ-উৎপীড়নে কীভাবে নিঃস্ব ও দুর্দশাগ্রস্ত হত, তার নিদর্শন 'নীলদর্পণ'। সরকারি কার্যসূত্রে দীনবন্ধু এই অত্যাচার ও দুর্দশার প্রত্যক্ষদর্শী। 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট'-এর সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বা ঝিনাইদহের মহেশচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায় বা নীলকুঠির 'দেওয়ান' চৌ-গাছার বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস নীল-বিদ্রোহ সংঘটিত করার উদ্দেশ্যে যেভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, দীনবন্ধু দীনহীন প্রজাদের সপক্ষে নাটক লিখে একই লক্ষ্যে প্রতিবাদ জানাতে চেয়েছিলেন।

কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসে নীলবিদ্রোহ (১৮৫৯-৬০) সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ঘটনা। এই সময়-কালে বাংলার অধিকাংশ অঞ্চল জুড়ে নীলচাষিদের যে গণ অসন্তোষ ও বিদ্রোহ তা নীলকরদের সুদীর্ঘ শোষণ-পীড়ন, লুণ্ঠন-হত্যা প্রভৃতি ভয়াবহ তাণ্ডবলীলার অনিবার্য ফলশ্রুতি। নীল বুনে বুনে বাংলার চাষির মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে নীল চাষ তার পক্ষে একান্তভাবে বাধ্যতামূলক। কিন্তু ১৮৫৯ সালে একটি ঘটনায় পরিষ্কার হয়ে যায়, নীলচাষ করা বা না করা প্রজাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। চাষিদের সঙ্গে নীলকরদের গোলযোগের আভাস পেয়ে বারাসতের তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেট এ্যাস্‌লি ইডেন কর্তৃপক্ষকে লিখে জানিয়েছিলেন,

'প্রজাই জমির মালিক, নীলকর নহে; প্রজার জমি বলপূর্বক দখল করিবার কোন অধিকার তাহাদের নাই এবং নীলকরেরা যেখানে আইন অমান্য করিয়া সেইরূপ করিবে, ম্যাজিস্ট্রেটগণ সেখানে প্রজার স্বত্ব রক্ষা করিতে বাধ্য'।[২]

২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৯ সালে ইডেন বাংলা ভাষায় একটি ঘোষণাপত্র প্রচার করে জানিয়ে দিলেন, 'নীলের জন্য চুক্তি করা বা না করা প্রজাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন'।[৩] একই পথ অনুসরণ করেন নদিয়া জেলার ম্যাজিস্ট্রেট হার্সেলও। বলা বাহুল্য, নীলচাষ আর বাধ্যতামূলক নয়—এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই বারাসত, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, পাবনা, যশোর, রাজশাহির কৃষকরা নীলচাষ না করার সংকল্প ঘোষণা করে। এই মনোভাব ক্রমশ বিস্তৃতিলাভ করে লোকনাথপুর ও মোল্লাহাটি কনসার্নের বিভিন্ন গ্রামে। বিদ্রোহের প্রথম পথ দেখায় জয়রামপুরের কৃষকরা। তারপর যুক্ত হয় একের পর এক মুর্শিদাবাদের শামসেরগঞ্জ থানার কাসিমনগর, মীরতোলা, পাঁচগাছা ও আশপাশের গ্রামের কৃষকরা। ১৮৬০ সালের মার্চ থেকে জুন মাসের মধ্যে বিদ্রোহ বিস্তৃত হয় ফরিদপুর, ঢাকা, মালদায়। চাষিদের জোর করে নীল বোনাতে চেষ্টা করলে সংগঠিত কৃষকরা বিভিন্ন নীলকুঠি আক্রমণ করে। আগুন লাগানো হয় লোকনাথপুর কনসার্নের খেজুরি কুঠিতে। প্রহৃত হন মোল্লাহাটি কনসার্নের মি. ক্যাম্পবেল। কোনোরকমে অব্যাহতি পান ওই কনসার্নের মি. হাইড। ধুবুরিবোনার কুঠির গোমস্তাকে মেরে ফেলে রাখা হয় রাস্তায়। আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় মুর্শিদাবাদের রাধাকৃষ্ণপুর কুঠিতেও। পরিস্থিতির বর্ণনা দিতে গিয়ে 'ইংলিশম্যান' পত্রিকা লেখে :

'বাংলায় এক কৃষক বিদ্রোহের সূচনা হয়েছে, সমস্ত গ্রামবাসী সদরে গিয়ে দাবী করছে নীল বুনতে তাদের যেন বাধ্য করা না হয়। বর্তমানে কয়েকটি গ্রামের কয়েক হাজার অধিবাসী দেশের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং যেখানে কোনো অসন্তোষ নেই সেইসব শান্তিপূর্ণ গ্রামবাসীদের তাদের সঙ্গে যোগ দিতে বাধ্য করছে। তারা হিংসাত্মক কাজকর্ম শুরু করেছে

যা পরিণামে গুরুতর রক্তক্ষয় ডেকে আনবে। পুলিশ তাদের বাধা দিতে অপারগ, এখনই সামাল না দিলে অবস্থা আরো জোরালো হয়ে উঠবে' (The Englishman ০৫.০৩.১৮৬০)।

একদিকে অসহযোগিতা, অপরদিকে সশস্ত্র প্রতিরোধ—এই হল নীলবিদ্রোহের দুটি অভিমুখ। নীল না বোনার সংকল্পে অবিচল চাষিরা ক্রমান্বয়ে নীলকর ও তার কর্মচারীদের ধোপা-নাপিত বন্ধ করে, কুঠির কর্মচারীদের জাতিচ্যুত করে, খাজনা দেওয়া বন্ধ করে বিপাকে ফেলতে থাকে। প্রজা উচ্ছেদের মামলা করেও সুবিধা হচ্ছিল না। শুধু অসহযোগিতাই নয়, কৃষকেরা নীলকরদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধেও শামিল হল। নীলকররাও বসে রইল না। প্রজাদের জব্দ করতে উঠেপড়ে লাগল—কখনও কুঠিতে ডেকে এনে লোক দিয়ে পেটানো কখনও বা বাছা বাছা লাঠিয়াল দিয়ে অবাধ্য প্রজাদের শায়েস্তা করত। কিন্তু এইসব অতর্কিত আক্রমণ থেকে বাঁচতে কৃষকরা যে সংগ্রাম-কৌশল বের করেছিল সে সম্পর্কে সতীশচন্দ্র মিত্র লিখেছেন,

'গ্রামের সীমায় একস্থানে একটি ঢাক থাকিত। নীলকরের লোক অত্যাচার করিতে গ্রামে আসিলে কেহ সেই ঢাক বাজাইয়া দিত, অমনি শত শত গ্রাম্য কৃষক লাঠিসোটা লইয়া দৌড়াইয়া আসিত। নীলকরের লোকেরা প্রায়ই অক্ষত দেহে পলাইতে পারিত না। সম্মিলিত প্রজাশক্তির বিরুদ্ধে দন্ডায়মান হওয়া সহজ ব্যাপার নহে।... সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পরে নানা সাহেব ও তাঁতিয়া টোপীর নাম দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল; নীল-বিদ্রোহী কৃষকগণও তাহাদের নেতাদিগকে এই সকল নামে অভিহিত করিত'।[৪]

সারা বাংলাব্যাপী নীলবিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল ৬০ লক্ষাধিক কৃষক। নদিয়া, যশোর, খুলনা, ফরিদপুর, চব্বিশ পরগনা, পাবনা প্রভৃতি জেলায় খুব কম গ্রামই ছিল যারা এই সংগ্রামে শরিক হয়নি। এই বিদ্রোহ অবশ্য কেউই পরিকল্পিত ভাবে সংগঠিত করেনি। দীর্ঘকালের অসহনীয় শোষণ-উৎপীড়নই এই বিদ্রোহের মূলে নিহিত ছিল। বিভিন্ন আঞ্চলিক নেতা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন নীলবিদ্রোহে। এঁদের মধ্যে উল্লেখ্য, রাণাঘাটের শ্যামচন্দ্র পালচৌধুরী, নড়াইলের রামরতন রায় ও তাঁর দেওয়ান মহেশ চাটুজ্জে, জয়রামপুরের পত্তনিদার মৌলিক পরিবারের রামরতন, রাসমোহন ও গিরিশ—তিন ভাই, অধিবাসী শিশিরকুমার ঘোষ, 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখার্জী। বিশেষত শিশিরকুমার ঘোষ চৌগাছার অধিবাসী বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাসকে নীলবিদ্রোহের নেতৃত্বের গৌরব দিতে চেয়েছেন। কারণ নীলকুঠির দেওয়ানের কাজ ছেড়ে কৃষকদের মধ্যে বিদ্রোহ সংগঠিত করার জন্য তাঁরা একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

ইতিমধ্যে ৩১ মার্চ ১৮৬০-এ সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী পাঁচজন সদস্যকে নিয়ে গঠিত হয় 'নীল কমিশন' : সরকার পক্ষে সিটনকার (সভাপতি) ও আর টেম্পল, নীলকর সাহেবদের পক্ষে ফার্গুসন, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে চন্দ্রমোহন চ্যাটার্জী এবং প্রজাস্বার্থ দেখার ক্ষেত্রে রেভা. সেল। ১৩ নং কিড স্ট্রিটের অফিসে কমিশন তাদের কাজ শুরু করে

মে মাস থেকে। ১৮ মে থেকে ৪ আগস্ট পর্যন্ত সরকারি কর্মচারি, নীলকর, জমিদার, মিশনারি ও কৃষকদের সাক্ষ্য গ্রহণ করে কমিশন তাদের প্রতিবেদন পেশ করে ২৭ আগস্ট। নীলকরদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হয় কমিশনের তদন্তে। সমস্ত দিক বিচার-বিবেচনা করে কমিশনের সিদ্ধান্ত—'The whole system... is vicious in theory, injurious in practice and radically unsound.'[৫] দুর্ভাগ্যের বিষয়, অভিযোগের নিদিষ্ট প্রমাণ সত্ত্বেও নীলকরদের বিরুদ্ধে সরকার কোনো ব্যবস্থাই নেননি। এমনকি গভর্নর গ্রান্ট সাহেব নীলচাষ বন্ধের নির্দেশ দিলেও কার্যত কোনো ফল হয়নি। তবে নীলের চাষ সম্পূর্ণত চাষিদের ইচ্ছাধীন—এহেন সরকারি ঘোষণায় নীলকরদের উগ্র মূর্তি ক্রমে শান্ত হয়ে আসে। কিছু কুঠি কারবার গুটিয়ে অন্য ব্যাবসায় মন দেয়, অন্যান্য কুঠিও অবশেষে বন্ধ হয়ে যায়।

নীল-আন্দোলনের এই ইতিহাসই স্পষ্ট রূপে ব্যক্ত হয়েছে দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নাটকে। কুটির গুদামঘরে রায়তদের কয়েদ করা, এক কুঠি থেকে আর এক কুঠিতে সরিয়ে সাত কুঠির জল খাওয়ানো, দাদনের বদলে গাদন, গ্রাম্য মেয়েদের পেছনে গোপন উদ্দেশ্য, সংবাদপত্রের ভূমিকা, শাসনব্যবস্থার প্রকৃত চিত্র—সমকালিক এইসব তথ্য ব্যবহৃত হয়েছে এ নাটকে। একথা সত্য, বাংলার অবহেলিত ও পদদলিত কৃষক সম্প্রদায়কে নিয়ে 'নীলদর্পণ'-এর মতো বাস্তব-অভিজ্ঞতাপ্রসূত গণনাটক যে সে-সময়ে রচিত হয়েছিল—এটাই এক যুগান্তকারী ঘটনা :

'দীনবন্ধু তাঁহার নাটকে দেখাইয়াছেন যে, ইংরেজ শাসকগণ বঙ্গদেশের কৃষক-সম্প্রদায়ের উপর 'নীলচাষ' নামক যে এক ভয়ঙ্কর সর্বগ্রাসী শোষণ-ব্যবস্থা চাপাইয়া দিয়াছে, তাহার চাপে কেবল বঙ্গদেশের কৃষক-সম্প্রদায়ই নহে, অন্যান্য শ্রেণীও বিপর্যয়ের সম্মুখীন। এই শোষণ-ব্যবস্থার চাপে বঙ্গদেশের স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষি-ব্যবস্থা, সমগ্র কৃষক-সম্প্রদায়, গ্রামাঞ্চলের আর্থিক ব্যবস্থা—সকলই চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। দীনবন্ধু যেন শহুরে মধ্যশ্রেণীকে ইঙ্গিতে আহ্বান করিয়াছেন বাংলার কৃষকের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া এই ভয়ঙ্কর জাতীয় বিপদ হইতে একসঙ্গে বঙ্গদেশকে রক্ষা করিতে। শহুরে মধ্যশ্রেণীর চেতনা জাগাইবার জন্য, তাহাদিগকে এই জাতীয় কর্তব্যে উদ্দীপিত করিবার জন্যই যেন তিনি বাংলার প্রধান সংগ্রাম-শক্তি, বাংলার আশা ভরসা স্বরূপ কৃষক-সম্প্রদায়ের চরম দুর্দশার অবিকল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাঁহার 'নীলদর্পণে'।'[৬]

সমালোচকের এ মন্তব্য যথার্থ। নীলকর-পীড়িত বাংলাদেশের এক জীবন্ত দলিল দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নাটক।

তিন.

পোস্টাল বিভাগের কর্মচারীদের মধ্যে 'সর্বাপেক্ষা সুদক্ষ' বলে পরিগণিত দীনবন্ধু মিত্রকে কাজের প্রয়োজনে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার বেশির ভাগ স্থানেই যেতে হয়েছিল। এমনকি

যে সব অঞ্চলে নীলচাষ হত, সেইসব প্রদেশেও তাঁর যাতায়াত ছিল নিয়মিত। স্বভাবতই কর্মসূত্রে নীলকরদের অত্যাচার ও বাঙালি প্রজার দুর্দশার তিনি অন্যতম সাক্ষী। এই প্রজাপীড়ন যেভাবে তিনি জেনেছিলেন, এমন আর কেউ জানতেন না। তাঁর প্রবল ও স্বাভাবিক সর্বব্যাপী সহানুভূতির বলে সেই পীড়িত প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশাকে প্রতিভাত করতেই তাঁর 'নীলদর্পণ' নাট্যরচনা। 'নীলদর্পণ' শুধু বিদ্রোহেরই দর্পণ নয়, অত্যাচারেরও দর্পণ। কারণ সমগ্র নাটকটিতে মূর্ত হয়েছে গ্রামাঞ্চলের একটা যন্ত্রণাবিদ্ধ আর্তনাদ। এ যন্ত্রণা একজন ব্যক্তি মানুষের নয়, সমগ্র স্বরপুর গ্রামের—ভূমির সঙ্গে সংলিপ্ত সমষ্টিগত মানুষের। গোলোকচন্দ্র বসুর পরিবার যেমন বিপর্যস্ত হয়েছে, তেমনই প্রতিবেশী রায়ত সাধুচরণের পরিবারও নীলকরদের অত্যাচারে দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছে। আসলে দীনবন্ধুর অভিপ্রেত ছিল সমগ্র কৃষক সমাজের আর্ত হাহাকার ও প্রতিরোধ বাসনাকে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তোলা। নদিয়ার গুয়াতেলির মিত্র পরিবারের দুর্গতি ও হতভাগ্য হারামণির দুর্ভাগ্য নাট্যঘটনার মূল উৎস। নাট্যকাহিনিতে চরিত্রগুলিকে ছাপিয়ে স্বরপুরের সর্বনাশ, নবীনমাধবদের পারিবারিক বিপর্যয়, ক্ষেত্রমণির নারীত্বের অবমাননা ও শয্যাকন্টকিত তার মৃত্যুকে অতিক্রম করে প্রতিবিম্বিত করেছে সমগ্র বাংলার সমকালীন কৃষকশ্রেণির অন্তর্লোকের ভাবরসটিকে। এদিক থেকে 'নীলদর্পণ' বাঙালি কৃষক জীবনের 'একটা যুগের মহানাটকের ভূমিকা' গ্রহণ করেছে।

'নীলদর্পণ' প্রকাশের সাথে সাথে সারা দেশে একটা অভূতপূর্ব আলোড়ন দেখা দেয়। এ নাটকের বাস্তবতা উচ্চকিত করেছিল হিতৈষী শিক্ষিত সমাজকে। পাদ্রি জেমস লঙ্ মধুসূদনকে দিয়ে নাটকটির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করলে তাঁর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেন 'ইংলিশম্যান' পত্রিকার সম্পাদক। বিচারপতি ওয়েলস তাঁকে একহাজার টাকা অর্থদণ্ড ও একমাস কারাদণ্ডের আদেশ দেন। আদালতে উপস্থিত হয়ে কালীপ্রসন্ন সিংহ জরিমানার টাকা দিয়ে দিলেও লঙের কারাবাস বন্ধ হয়নি। এতে বিপরীত ফলই ফলেছিল। ভদ্র ও বিশিষ্ট ইংরেজরা নীলকরদের অত্যাচারে ক্ষুণ্ণ হয়। এর প্রতিবিধানের প্রচেষ্টা চালাতে থাকে নানাভাবে। আর এই ভাবেই ইতিহাসের একটা অধ্যায়ে চিহ্নিত হয়ে গেল 'নীলদর্পণ' নাটকটি। এ প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী যথার্থ মন্তব্যই করেছেন :

'এই আর এক ঘটনা যাহাতে বঙ্গসমাজে তুমুল আন্দোলন তুলিয়াছিল। কোন গ্রন্থ বিশেষ যে সমাজকে এতদূর কম্পিত করিতে পারে তাহা অগ্রে আমরা জানিতাম না। 'নীলদর্পণ' কে লিখিল, তাহা জানিতে পারা গেল না; কিন্তু বাসাতে বাসাতে 'ময়রাণী লো সই নীল গেজেছ কই?' ইত্যাদি দৃশ্যের অভিনয় চলিল'।[৭]

বাংলার অবমানিত কৃষক সমাজকে নাট্যসাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করে বাংলা সাহিত্যের নবযুগের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলেই 'নীলদর্পণ' হয়ে উঠেছে 'বাস্তবধর্মী গণসাহিত্যের অগ্রদূত'। ইংরেজের ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার ভয়াবহতা, নীলচাষের ফলে কৃষিকেন্দ্রিক গ্রামবাংলার চরম অর্থনৈতিক বিপর্যয়, নীলকর সাহেবদের অত্যাচারে সাধারণ মানুষের

দুর্বিষহ জীবন 'নীলদর্পণ'-এ সঞ্চার করেছিল গণবিক্ষোভের উত্তাপ। ফলত অবহেলিত, উপেক্ষিত মানুষের হাসিকান্না, ব্যথা-বেদনার পাশাপাশি এক নতুন বলিষ্ঠ জীবনরূপ বস্তুতন্ত্রের সূচনা করল বাংলা নাট্যসাহিত্যে। আর এইখানেই 'নীলদর্পণ'-এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব।

চার.

যে জাতির থিয়েটার নেই, সে জাতির ইতিহাস নেই—একথা অবিতর্কিতভাবে সত্য। থিয়েটার জাতীয় জীবনের দর্পণ স্বরূপ। জীবনের বহুবিচিত্র দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামের মানস ভাবনা থিয়েটারের মুকুরে প্রতিবিম্বিত হয়। দ্বন্দ্ব যেমন নাটকের প্রাণ, তেমনি থিয়েটারেরও। দ্বন্দ্ব ব্যতীত যেমন নাটকের নাটকীয়ত্ব তিরস্কৃত, তেমনি জীবনদর্শনের নিরবধি বিদ্রোহের স্ফুরণ ভিন্ন থিয়েটারের সত্যও অনবগুন্ঠিত। তাই থিয়েটার শ্রেণি সমাজের মুক্তির পথ, বিপ্লবের অন্যতম হাতিয়ার।

থিয়েটারের এই সত্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস পর্যালোচনায় প্রথমেই মনে আসে ন্যাশনাল থিয়েটারের কথা। সেইসঙ্গে দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নাটকেরও। কারণ ১৮৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত বাঙালির প্রথম পেশাদার রঙ্গমঞ্চ ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম নাটক এই 'নীলদর্পণ'। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসের স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, ন্যাশনাল থিয়েটারের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা নাট্যশালার যুগ নিতান্তই 'সখের থিয়েটারের যুগ'। এই যুগে কমপক্ষে যে ১২টি নাট্যশালা গড়ে উঠেছিল তার বেশির ভাগই ধনী অভিজাত শ্রেণির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

দ্বিতীয়ত, এইসব নাট্যশালায় অভিনীত নাটকের বেশির ভাগই সংস্কৃত নাটক ও শেক্সপীয়রীয় নাটকের অনুবাদমাত্র। কারণ তখনও পর্যন্ত বাংলা নাটক ও নাট্যাভিনয়ের অবিচ্ছিন্ন ধারা গড়ে ওঠেনি।

তৃতীয়ত, পরিচিত আত্মীয়-বন্ধুদের মধ্যে এইসব নাট্যশালা একান্তভাবে সীমাবদ্ধ থাকায় সাধারণ মানুষের প্রবেশাধিকার সেখানে একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল।

চতুর্থত, হুজুগপ্রিয়তার ফলে এইসব নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, ফলে স্বাভাবিক কারণেই তা বিলুপ্তির গর্ভে তলিয়ে যেতে দেরি হয়নি।

পঞ্চমত, থিয়েটারের দর্পণে যে দুনিয়ার সর্বহারা মানুষের অনিবার্য শ্রেণিদ্বন্দ্বের বিদ্রোহ ভাবনা প্রতিবিম্বিত হতে পারে, আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা সোচ্চার হয়ে উঠতে পারে এ সচেতনতা তখনও সাধারণের মধ্যে অনুভূত হয়নি।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৭২ সালের ৭ ডিসেম্বর বাংলায় ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা প্রকৃতই এক নতুন দিক উন্মোচনের পথ-প্রদর্শক। শুধু তাই নয়, অভিজাত সম্প্রদায়ের একান্ত কুক্ষিগত নাট্যশালা থেকে ন্যাশনাল থিয়েটার সর্বৈবভাবে বিবরমুক্ত থিয়েটার। প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ততান্ত্রিক সম্প্রদায়ের শৃঙ্খল ভেঙে সর্বপ্রথম সর্বসাধারণের নাট্যশালারূপে ন্যাশনাল

থিয়েটার যথার্থভাবে আত্মপ্রকাশ করে। প্রকৃতপক্ষে, বিদ্রোহের অন্তর্জ্বালা বিদীর্ণ গর্ভ থেকেই ন্যাশনাল থিয়েটারের জন্ম।

১৮৭২ সালের ৭ ডিসেম্বর এই বিদ্রোহী থিয়েটার তার প্রথম পদযাত্রা শুরু করে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাট্যাভিনয়ের মধ্য দিয়ে। থিয়েটারের মধ্যে যে সংগ্রামী সত্য ভাবনার বীজ অঙ্কুরিত, সে-ভাবনার সফল রূপায়ণ দেখা গেল 'নীলদর্পণ'-এ। শুধু তাই নয়, তৎকালীন সাম্রাজ্যবাদী সামন্ততন্ত্রের শোষণের বিরুদ্ধে প্রথম আঘাত হানে 'নীলদর্পণ'। এর প্রমাণ রয়েছে ১৮৭৫ সালের লক্ষ্ণৌ শহরে নীলদর্পণের অভিনয়ে ক্ষিপ্ত ব্রিটিশ দর্শকগণের অভিনেতাদের আক্রমণে। সে-ঘটনার বিবরণ অভিনেত্রী বিনোদিনী দাসীর 'আমার কথা'-য় :

'একরাত্রি লক্ষ্ণৌ নগরে ছত্রমন্ডিতে আমাদের 'নীলদর্পণ' অভিনীত হইতেছিল, সেইদিন লক্ষ্ণৌ নগরের প্রায় সকল সাহেব থিয়েটার দেখিতে আসিয়াছিলেন। যে-স্থানে রোগ সাহেব ক্ষেত্রমণির উপর অবৈধ অত্যাচার করিতে উদ্যত হইল, তোরাপ দরজা ভাঙ্গিয়া রোগ সাহেবকে মারে, সেই সময় নবীনমাধব ক্ষেত্রমণিকে লইয়া চলিয়া যায়। একে তো নীলদর্পণ পুস্তকই অতি উৎকৃষ্ট অভিনয় হইতেছিল, তাহাতে বাবু মতিলাল সুর তোরাপ, অবিনাশ কর মহাশয় মিস্টার রোগ সাহেবের অংশ অতিশয় দক্ষতার সহিত অভিনয় করিতেছিলেন। ইহা দেখিয়া সাহেবেরা বড়ই উত্তেজিত হইয়া উঠিল। একটা গোলযোগ হইয়া পড়িল এবং একজন সাহেব দৌড়িয়া একেবারে স্টেজের উপর উঠিয়া তোরাপকে মারিতে উদ্যত হইল'।[৮]

ভারতবর্ষের ইতিহাসে গণ-আন্দোলনের অন্যতম হল নীলবিদ্রোহ। ১৮৫৯ থেকে ১৮৬১ সালের কালসীমায় এই নীলবিদ্রোহের বিকাশ ও বিবর্ধন। এই প্রসঙ্গে সিপাহিবিদ্রোহ, ত্রিপুরার কৃষক বিদ্রোহ, গারো বিদ্রোহ, সুন্দরবনের বিদ্রোহের কথাও স্মর্তব্য। বাস্তবিক নীলবিদ্রোহের মধ্যে সর্বপ্রথম কৃষক বিদ্রোহের প্রথম পদক্ষেপ পরিলক্ষিত হয়। 'নীলদর্পণ' নাটকে প্রবল রাষ্ট্রশক্তির প্রতীক রোগ সাহেবের বিরুদ্ধে তোরাপ ও রাইচরণের যে ঘৃণা প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে তার মধ্যে সমগ্র কৃষক সম্প্রদায়ের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সর্বোচ্চ রূপ অভিব্যক্তি লাভ করেছে সে কথা বলাই বাহুল্য। বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতিতে 'নীলদর্পণ' যে নবযুগের সৃষ্টি করেছিল, ব্যাপক আলোড়নের ভিত্তিতে বাঙালির চেতনা জাগিয়ে তুলতে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করেছিল সে-বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে গবেষক প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্ত যা বলেছেন তা প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য :

'১৮৭২ সালে অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফি প্রমুখ কলকাতায় ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপন করে সর্বপ্রথম সাধারণের টিকিট বিক্রি করে যে নাটক অভিনয় করেছিলেন তা হলো 'নীলদর্পণ'। এর পূর্বে কলকাতায় যে সব নাটকের অভিনয় হতো তাতে সাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল না, একমাত্র ধনী ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীরাই নিমন্ত্রিত হয়ে তাতে যোগদান করতে পারতেন। রুচির দিক দিয়েও সেগুলি ছিল খুব নিম্নমানের নাটক। 'নীলদর্পণ' কেবলমাত্র সাধারণ মানুষকে নিয়েই প্রথম নাটক নয়, তা জনসাধারণের জন্য প্রথম নাটকও বটে। এইজন্য দীনবন্ধুকে

গিরিশচন্দ্র বাঙলার রঙ্গালয়ের স্রষ্টা বলেছেন। প্রথমে গিরিশচন্দ্র 'নীলদর্পণে' অংশগ্রহণ করেননি, কিন্তু ১৮৭৩ সালে টাউন হলে তিনি তাতে অভিনয় করেছিলেন। 'নীলদর্পণে' যাঁরা অংশগ্রহণ করতেন তাঁদের সবসময় পুলিশের হাতে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবার আশঙ্কা নিয়ে থাকতে হতো। এবং শেষ পর্যন্ত ১৯০৮ সালে 'নীলদর্পণ' ইংরেজ-বিদ্বেষী ও রাজদ্রোহী এই অজুহাতে তার অভিনয় নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়'।[৯]

'নীলদর্পণ'-এর বিচ্যুতি সম্পর্কে সমালোচকদের ভিন্ন ভিন্ন মত। কেউ 'নীলদর্পণ'-কে নাটক না বলে বলেছেন 'নাট্যচিত্র'। কেউ বলেছেন, 'নীলদর্পণ' বিষাদান্ত হলেও ট্রাজেডি হয়নি, বরং এর প্রবণতা অনেকটাই মেলোড্রামার দিকে। কেউ আবার 'নীলদর্পণ'-কে সার্থক নাটক বলে স্বীকৃতি দিতেও নারাজ। নাট্যকারের মনোভাব ও সৃষ্টি এ নাটকে আদৌ সমাসক্ত হয়নি। গোলোক বসু ও সাধুচরণের পরিবারের কাহিনি কেন্দ্রচ্যুত। দুটি পরিবারের কেউই প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে তো পারেইনি, বরং শেষ পর্যন্ত তলিয়ে গেছে সর্বনাশের অতলে। এমনকি, নায়কত্ব ধারণ করার শক্তিও 'স্বরপুর-বৃকোদর' নবীনমাধবের ছিল না। সর্বোপরি নীলদর্পণের সংলাপের ভাষা একদিকে উল্লেখ্য সাফল্য, অন্যদিকে বহন করেছে গুরুতর ব্যর্থতা। তাই রাষ্ট্রশক্তির বিরোধিতার কারণে ও অন্তর্বস্তুর যথার্থতায় কালজয়ী হলেও 'নীলদর্পণ' দীনবন্ধুর শ্রেষ্ঠ নাটক নয়। শিল্পসৃষ্টি হিসেবে 'নীলদর্পণ'-এর তুলনায় 'সধবার একাদশী' দীনবন্ধুর সার্থকতম নাটক।

প্রসঙ্গত স্মর্তব্য, বিচ্যুতি সত্ত্বেও 'নীলদর্পণ' নাটকে আন্দোলিত হয়েছে একটা কালের, একটা সমাজের জীবন-তরঙ্গ। সে আলোড়নের স্বীকৃতি শিবনাথ শাস্ত্রীর ভাষ্যেও :

'নাটকখানি বঙ্গসমাজে কি মহা উদ্দীপনার আবির্ভাব করিয়াছিল, তাহা আমরা কখনও ভুলিব না, আবালবৃদ্ধবণিতা আমরা সকলেই ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছিলাম। ঘরে ঘরে কথা, বাসাতে বাসাতে তাহার অভিনয়। ভূমিকম্পের ন্যায় বঙ্গদেশের সীমা হইতে সীমান্ত পর্যন্ত কাঁপিয়া যাইতে লাগিল' ('জাতীয় সাহিত্য ও জাতীয় উদ্দীপনা')।

এ স্মৃতিচারণে আবেগের মাত্রা বেশি হলেও বিবৃতিতে সত্য আছে। দীনবন্ধুর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে বঙ্কিমচন্দ্র 'রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী ও গ্রন্থাবলীর সমালোচনা' লিখতে গিয়ে এ সত্যের স্বরূপ আগেই নির্দেশ করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন,

'নীলদর্পণ বাঙ্গালার Uncle Tom's cabin. 'টম কাকার কুটীর' আমেরিকার কাফ্রিদিগের দাসত্ব ঘুচাইয়াছে; নীলদর্পণ, নীল দাসদিগের দাসত্ব মোচনের অনেকটা কাজ করিয়াছে। নীলদর্পণে, গ্রন্থকারের অভিজ্ঞতা এবং সহানুভূতি পূর্ণমাত্রায় যোগ দিয়াছিল বলিয়া, নীলদর্পণ তাঁহার প্রণীত সকল নাটকের অপেক্ষা শক্তিশালী। অন্য নাটকের অন্য গুণ থাকিতে পারে, কিন্তু নীলদর্পণের মত শক্তি আর কিছুতেই নাই'।[১০]

এই 'শক্তি'-ই 'নীলদর্পণ'-এর প্রতিবাদের উৎস-মুখ। এই 'শক্তি'-র সাফল্যেই চিরন্তনতাকে অতিক্রম করে গেছে 'নীলদর্পণ'। আর এখানেই 'নীলদর্পণ'-এর যাবতীয় গৌরব।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বাঙালির স্বাজাত্যবোধ ও জাতীয় চেতনা জাগিয়ে তুলতে 'নীলদর্পণ' যে একটি প্রগতিশীল ভূমিকা গ্রহণ করেছিল সেকথা অবিতর্কিত সত্য।

পাঁচ.

'নীলদর্পণ' (১৮৬০) থেকে 'নবান্ন' (১৯৪৪)-এ পৌঁছোতে লেগে যায় দীর্ঘ পথ। প্রায় চুরাশি বছর। এই সময়কালে সংঘটিত কিছু ঘটনাবলির কথা জানা অত্যন্ত জরুরি। 'নীলদর্পণ'-এর পর উনিশ শতকের শেষভাগে বেশ কয়েকটি 'দর্পণ' নাটক লেখা হয়েছিল যার মধ্যে উল্লেখ্য : গ্রামের দুর্দশার চিত্র নিয়ে প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের 'পল্লীগ্রাম দর্পণ' (১৮৭৩), জমিদারদের পাশবিক অত্যাচারের বিষয় নিয়ে মীর মশার্‌রফ হোসেনের 'জমিদার দর্পণ' (১৮৭৩), কেরানি জীবনের বাস্তবচিত্র অবলম্বনে যোগেন্দ্র ঘোষের 'কেরানি দর্পণ' (১৮৭৪), জেলের কয়েদির ওপর অকথ্য অত্যাচারের কাহিনি নিয়ে দক্ষিণারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের 'জেল দর্পণ' (১৮৭৫) এবং চা-কুলিদের ওপর শ্বেতাঙ্গ চা-করদের উৎপীড়নের কাহিনি নিয়ে 'চা-কর দর্পণ' (১৮৭৫) নাটক। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে ১৮৭৫ সালে উপেন্দ্রনাথ দাসের 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' (১৮৭৫) নাটকটি অভিনীত হলে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে আক্রমণ করার অপরাধে তারই ফলশ্রুতি হিসেবে ১৮৭৬ সালে রচিত হয় Dramatic Performances Control Bill বা অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন। এহেন আইনের বলে শ্রেণিশত্রুর বিরুদ্ধে থিয়েটারের সংগ্রামী ভূমিকার কণ্ঠরোধ করা হ'ল, নাটকের ওপরও অচিরেই নেমে এল শাসকের দমন-পীড়ন নীতি। এহেন পরিস্থিতির প্রশমনে যিনি অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারতেন, সেই কবি নট নাট্যকার প্রয়োগাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯২২) সমকালীন বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে নিমগ্ন হন গণনাট্যবিরোধী নাট্যরচনায়। গিরিশ-প্রতিভার সৃজনী-শক্তির পূর্ণ বিকাশ তো ধর্ম, পুরাণ, ভক্তিবাদ, কথকতা, পৌরাণিক নাটকের মতাদর্শপ্রচারে। তিনি নিজেই বলেছিলেন, 'হিন্দুস্থানের মর্মে মর্মে ধর্ম। মর্মাশ্রয় করিয়া নাটক লিখিতে হইলে ধর্মাশ্রয় করিতে হইবে'।[১১] যুক্তির বিরোধিতা করে কেউ কেউ অবশ্য 'নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন' বা ভক্তিবাদের নবজাগরণে 'নব্য হিন্দু আন্দোলনে'র কথা তুলবেন। 'সিরাজদ্দৌলা' বা 'মীরকাশিম'-এ জাতীয় মুক্তির আবেগ প্রতিফলিত হলেও যুগ ও দায়িত্বের তুলনায় তা ছিল নিতান্তই নগণ্য। এই প্রসঙ্গে স্মরণে রাখা আবশ্যক, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় অভিহিত 'Bengal's greatest playwright' ('Bengalee' পত্রে 'মীরকাশিম' সমালোচনাকালে) দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের মহলা দেবার সময় 'ন্যাশনাল থিয়েটার'-এর নাম, টিকিট বিক্রির মাধ্যমে অভিনয় করা ব্যাপারে স্বয়ং গিরিশচন্দ্রের অমত ছিল। এ বিষয়ে অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফীর সঙ্গে তাঁর মতান্তর ঘটে এবং তিনি দল ছেড়ে চলে যান। কিন্তু সেই ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত 'নীলদর্পণ'-এর খ্যাতি ও প্রশংসা ছড়িয়ে পড়লে অবিলম্বে গিরিশচন্দ্র বিদ্বেষপ্রসূত হয়েই 'নীলদর্পণ'-এর অভিনয় সম্বন্ধে রচনা করেছিলেন একটি ব্যঙ্গ-কবিতা :

'লুপ্তবেণী বইছে তেরোবার।
তাতে পূর্ণ অর্দ্ধ-ইন্দুকিরণ সিঁদুর মাখা মতির হার।।
নগ হ'তে ধারা ধায়,
সরস্বতী ক্ষীণকায়,
বিবিধ বিগ্রহ ঘাটের উপর শোভা পায়;—
শিব শম্ভুসুত মহেন্দ্রাদি যদুপতি অবতার'।।

এছাড়াও 'নীলদর্পণ'-এর অভিনয় নিয়ে বিদ্রূপপূর্ণ সমালোচনাও লিখেছিলেন তিনি ছদ্মনামে, 'The Indian Daily News' নামক সংবাদপত্রে। স্বভাবত রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক সংগ্রামই যে থিয়েটারের মঞ্চ থেকে নিষ্কাশিত হয়ে গেল তাই নয়, থিয়েটার ক্রমশ হারিয়ে যেতে থাকে গীতিনাট্য, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকের অনুবর্তনে।

ছয়.

এই প্রেক্ষাপটে বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' বিচার্য। অবশ্য 'নবান্ন'-র আগেই ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখেছিল 'Youth Cultural Institute' বা 'YCI' (১৯৪০), 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি' (১৯৪১), 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পীসংঘ' (১৯৪২) এবং নিখিল ভারত গণনাট্য সংঘ' (১৯৪৩)-এর অভ্যুদয়। ১৯৪৩ সালে বোম্বাই শহরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেসের প্রাক্কালে প্রগতি লেখক সংঘের তৃতীয় সর্বভারতীয় সম্মেলনের (২৩-২৯ মে) পাশাপাশি ২৫ মে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ'। সংঘের প্রথম অধিবেশনে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল :

This conference held under the auspices of the Indian People's Theatre Association recognise the urgency of organising a people's theatre movement throughout the whole of India as the means of revitalizing the stgage and the traditional arts and making them atonce the expression and organiser of our people's **struggle for freedom, cultural progress and economic justice.**[১৩]

গণনাট্য সংঘের এই অধিবেশনে সর্বভারতীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন অনিল ডি সিলভা, যুগ্ম-সম্পাদক বিনয় রায় ও কে টি চণ্ডী এবং কোষাধ্যক্ষ খাজা আহ্‌মদ আব্বাস। কমিটির অন্যান্যদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হন সর্বভারতীয় কিষাণ সভার সভাপতি বঙ্কিম মুখার্জি, সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে এস এ ডাঙ্গে, সর্বভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘের সাধারণ সম্পাদক সজ্জাদ জহীর এবং ভারতীয় ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদকরূপে অরুণ বসু। সেই সময়কার বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে আটটি প্রদেশের জন্য যে প্রাদেশিক সাংগঠনিক কমিটি তৈরি হয়েছিল তাতে বাংলার সদস্য হিসেবে ছিলেন সুনীল চ্যাটার্জি, দিলীপ রায়, শম্ভু মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য, সুজাতা মুখার্জি, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, স্নেহাংশু আচার্য, বিষ্ণু দে এবং বিনয় রায়।

ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রথম সম্মেলনের খসড়া প্রস্তাবে বলা হয়েছিল :

It is necessary that not only the themes of our songs, ballads, plays, etc. be suited to the purpose in view, but it is also essential that our productions should be **simple** and **direct** so that the masses can easily appreciate and understand and also participate in the creation and production of these. A revival of the folk arts, mass singing and open air stage and specially desirable for this purpose.[১৪]

এই প্রস্তাব অনুযায়ী গণনাট্য সংঘের সেই শুরুর পর্বে সাংগঠনিক কাজকর্ম ছিল সত্যিই গৌরবের। মূলত গান, নাচ, আর নাটক নিয়েই গণনাট্যের যাত্রারম্ভ। 'People's theatre stars the people' ধ্বনিতে সেদিন শুধু মাদকতাই না, ছিল উদ্দীপনাও। বস্তুত গান, নাচ, নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে আন্দোলনের বক্তব্য দেশবাসীর সামনে উপস্থিত করাই ছিল সংঘের মূল লক্ষ্য। সে অনুভবের কথা লিখেছেন কুমার রায়।

গানের ক্ষেত্রে প্রকৃতই 'People's Theatre stars the people' কথাটার যাথার্থ্য খুঁজে পাওয়া যায়। 'গণ'-এর জন্য এবং 'গণ'-এর দ্বারা কথাটা গানের ক্ষেত্রে সমধিক প্রযোজ্য। গণনাট্যের কনসেপ্ট্ অন্তত এই ক্ষেত্রে আশ্চর্য সাফল্য লাভ করেছিল। গণজীবন এবং গণ-এর প্রত্যক্ষ প্ররোচনা এবং প্রেরণায় সঞ্জীবিত হয়েছিল গণসঙ্গীত।[১৫]

১৯৪৩ সালে বোম্বাই সম্মেলনে বাংলায় সাংস্কৃতিক স্কোয়াড কর্তৃক অভিনীত বিনয় ঘোষের 'ল্যাবরেটরি'-ই গণনাট্যের প্রথম নাটক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গণনাট্যসংঘের প্রাদেশিক সাংগঠনিক কমিটি ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পীসংঘের সঙ্গে যুক্ত থেকেই অব্যাহত রেখেছিলেন তাঁদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড। বিনয় ঘোষের 'ল্যাবরেটরি' নাটকের পরে বিজন ভট্টাচার্য লেখেন 'জবানবন্দী' এবং মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য 'হোমিওপ্যাথি' নামে একাঙ্কিকা। 'অরণি' পত্রিকা ছাড়াও এই তিনটি নাটক একত্রে 'তিনটি নাটিকা' নামে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পীসংঘ কর্তৃক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪৪ সালের জানুয়ারি মাসে। 'আগুন', 'জবানবন্দী'-র পর 'অরণি'-র তৃতীয় বর্ষ ৩৬-৪৩ সংখ্যায় প্রকাশিত 'নবান্ন'-ই (চারটি অঙ্ক ও পনেরোটি দৃশ্যে বিন্যস্ত) বিজন ভট্টাচার্যের পূর্ণাঙ্গ নাটক। বাংলা নাটক ও মঞ্চে কেবল বিপ্লব ঘটানো নয়, 'নবান্ন' আজও এক 'দিশারী জয়স্তম্ভ'ও। 'নবান্ন'-র সে ইতিহাস লিখেছেন গঙ্গাপদ বসু :

মনে আছে, দেশে গিয়েছিলাম কিছুদিনের জন্যে। ফিরে এলে বিজন জিজ্ঞাসা করলো : 'চাষীদের অবস্থা কি দেখে এলি বল্'। আমি বললাম, 'ধান হয়েছে প্রচুর, পেকেছেও। কিন্তু কাটবার, কেটে ঘরে তোলবার ক্ষমতা নেই চাষীদের—সবাই রোগা ভোগা অনশনক্লিষ্ট। তবে ওরা একটা ভাল পন্থা বার করেছে।' 'কী বল্ দিকি?' বিজনের সাগ্রহ প্রশ্ন। 'সবাই মিলে এক একদিন জোট বেঁধে এক একজনের জমির ধান কেটে ঘরে তুলে দেবে। এই পুরোনো

গাতায়-খাটা ব্যবস্থাটা ওরা আবার চালু করেছে। এই নিয়ে উৎসবের আয়োজনও হচ্ছে।' ব্যাস—বিজন পেয়ে গেল বোধহয় নাটকের শেষটার হদিশ।[১৬]

আসলে পেশাদারি থিয়েটারের ভিতটাকে ভেঙে দিয়ে 'নবান্ন' মঞ্চে নিয়ে এসেছিল গণজীবনের দীপ্তি। গিরিশ ঘোষ-শিশির ভাদুড়ির ঐতিহ্যগত পরম্পরার সঙ্গে মিলেছিল বিজন ভট্টাচার্যের আধুনিক থিয়েটারের চেতনা-লব্ধ জীবনদর্শন। অবশ্য এর নেপথ্যে ছিল কমিউনিস্ট পার্টি ও তার নির্দেশিত কালচারাল ফ্রন্টের নিরলস কর্মোদ্যোগ। 'পিপলস্ থিয়েটার'-এর লক্ষ্যে স্থির, মার্কসবাদী দর্শনে প্রত্যয়নিষ্ঠ বিজন ভট্টাচার্য এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন 'নবান্ন'-র নাট্যচিন্তা প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত :

'কমিউনিস্ট পার্টি আমার বাহ্য-ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের পিছনে মানসিকতার দিক দিয়ে... দিব্যশক্তির কাজ করেছে; যে কোনও ঘটনা বা বিষয়বস্তুকে সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে জানতে বুঝতে দেখতে শিখিয়েছে। গণনাট্য সংঘ বা পি ডবল্যু এ-র ভূমিকাও ঠিক তেমনি আমার জ্ঞানকাণ্ডে প্রত্যক্ষ প্রভাব রেখেছে। বাস্তববাদী দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি দুর্গত দুনিয়ার শিল্পীর একমাত্র বর্ম, যেটা শস্ত্রের মতো বিপদে আপদে, প্রত্যক্ষ কি পরোক্ষ, শিল্পীকে সদা রক্ষা করে।... আমার ধারণায় কমিউনিজম্ একটা বলিষ্ঠ প্রেমতরঙ্গ, জীবনকে জড়িয়ে যে তরঙ্গ স্বর্গ মর্ত্য পাতালকে জড়িয়ে প্রাণচৈতন্যে সার্থক হবার অপেক্ষা রাখে'।[১৭]

'নবান্ন' তাই নিছক অবমানিত, ছিন্নমূল জীবনের দর্পণমাত্র নয়, আকাল মন্বন্তরের বিরুদ্ধে প্রতিরোধও। সচেতন শিল্পের তাগিদ অপেক্ষা এ নাটকে বড়ো হয়ে উঠেছে আমিনপুরের দুঃস্থ কৃষকদের ভয়ংকর জীবন-ভাষ্যকে জনসমক্ষে তুলে ধরার নাট্যকারের এক আত্যন্তিক আর্তি। স্বভাবত 'নবান্ন' প্রযোজনা সমালোচকদের প্রাণিত করেছিল এই কারণে, এ নাটকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক অভিনয়-কলার পরিবর্তে শুধু নতুন দৃষ্টিভঙ্গিই নয়—নাট্যকলা, অভিনয়, মঞ্চসজ্জা, সংগীতপ্রয়োগ, একটা সময়কালের রাজনৈতিক প্রত্যয় ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, ডায়ালেক্ট্ এবং ল্যাঙ্গুয়েজ—সব কিছু জুড়ে যেন প্রতিভাসিত এক সামগ্রিক বাস্তব জীবনমুখিনতার আবহ। গণনাট্যের নায়কত্ব অর্জন করল সাধারণ জনগণ।

'নবান্ন' প্রথম অভিনীত হয় শ্রীরঙ্গমে ১৯৪৪ সালের ২৪ অক্টোবর। শম্ভু মিত্র ও বিজন ভট্টাচার্যের নির্দেশনায় এ-নাটকে সেদিন অভিনয় করেছিলেন বিজন ভট্টাচার্য, সুধী প্রধান, মণিকা ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র, সজল রায়চৌধুরী, গঙ্গাপদ বসু, চারুপ্রকাশ ঘোষ, নীহার দাশগুপ্ত, মনোরঞ্জন বড়াল, চিত্ত হোড়, গোপাল হালদার, শম্ভু ভট্টাচার্য, বিমলেন্দু ঘোষ, সমর রায়চৌধুরী, অজিত মিত্র, মণিকুন্তলা সেন, শোভা সেন, তৃপ্তি ভাদুড়ি প্রমুখ শিল্পীরা। প্রযোজনা, পরিচালনা ও অভিনয়ের দিক থেকে 'নবান্ন' কতটা অভিনব ছিল তার প্রমাণ মেলে সে-সময়ের সাময়িকপত্রের রিপোর্টে :

গত ২৪শে অক্টোবর ভারতীয় গণনাট্য সংঘের উদ্যোগে বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকের অভিনয় হইয়া গিয়াছে। প্রেক্ষাগৃহটি বহু সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিল্পী ও গুণী ব্যক্তিতে

পরিপূর্ণ ছিল।... আগস্ট আন্দোলন, বন্যা, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর পটভূমিকায় এই নাটকের গল্পাংশ রচিত এবং সমাজের যাহারা একেবারে নীচের তলায়, বাঙ্গালার সেই দুঃস্থ কৃষকদের জীবন ইহাদের মধ্যে প্রতিফলিত। ইহা সত্যসত্যই গণজীবনের প্রতিচ্ছবি।... একদা মুকুন্দ দাস যে ধরনের 'স্বদেশী যাত্রা' প্রবর্তন করিয়া বাংলাদেশে যাত্রার মধ্য দিয়া স্বদেশী ভাবধারায় ও সমাজ সংস্কারের আন্দোলন জাগাইয়া তুলিয়াছেন, গণনাট্য সংঘের 'নবান্ন' কিম্বা ইহার আগে 'জবানবন্দী' অভিনয়ও সেই ধরনের কল্যাণকর প্রচারকার্যের সহায়তা করিতেছে। তবে ইহার আবেদন আরও দূরপ্রসারী—লক্ষ লক্ষ মূক জনসাধারণের শোষিত জীবনের ইহা বেদনার বার্তা। ('যুগান্তর', ২৭ অক্টোবর, ১৯৪৪)

'নবান্ন' নাটকে চাল ব্যাবসায়ী কালীধন ধাড়ার সরকার রাজীব চরিত্রের অভিনেতা সজল রায়চৌধুরীও (প্রবীণ গণনাট্যকর্মী—একাধারে সংগঠক, অভিনেতা, নাট্যকার) এ-নাটকের প্রযোজনা ও অভিনয়ের কথা বলেছেন উচ্ছ্বল আবেগে :

কলকাতা যেন ভেঙে পড়ল শ্রীরঙ্গমে। কত লোক যে টিকিট পায়নি তার লেখাজোখা নেই। সংবাদপত্রের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। নাট্যরথীরাও নবান্নর সুখ্যাতিতে পঞ্চমুখ। কমিউনিস্ট ও প্রগতিবাদীরা গৌরব অনুভব করলেন। কিছু কিছু সমালোচনা তর্কবিতর্কও হয়েছে। কিন্তু সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন নবান্ন নাট্যজগতে ঘটিয়েছে পালাবদল। কি প্রযোজনা —কি অভিনয়ে—কি বিষয়বস্তুতে নবান্ন আগামী দিনের গণনাট্য ও গণতান্ত্রিক নাট্য আন্দোলনের হল পথিকৃৎ।... একাত্ম হল গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও নাট্যকর্ম।[১৮]

'নবান্ন'-র অন্যতমা অভিনেত্রী মণিকুন্তলা সেনও তাঁর অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন অকপটে :

যে মানুষেরা রাস্তায় দুর্ভিক্ষের মড়া দেখে মুখ ফিরিয়ে গেছে, 'নবান্ন' নাটক দেখিয়ে সেই মানুষদের চোখে আমরা জল ঝরাতে পেরিছি—এটা ছিল আমাদের কৃতিত্ব।[১৯]

এ-কথা অনস্বীকার্য, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার প্রেক্ষিতে মন্বন্তরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যেও খাদ্যাভাব, বন্যা, রোগ, গৃহহীনতার বিরুদ্ধে একদিকে নিরন্তর লড়াই এবং তা থেকে সমুত্তীর্ণ হবার নির্দেশ এ-নাটক সর্বার্থে মানুষকে আবার উদ্দীপিত করেছিল নতুন জীবনবোধে। নাটকের উপসংহারে দয়াল মণ্ডলের শেষ সংলাপে তাই আগামী দিনের প্রতিরোধ ও জোটবাঁধার শপথ :

'কিন্তু এ কথাও জেনো প্রধান, যে গতবারের মতো এবার আর আকাল আচম্বিত এসে আমার চোখের ওপর আমারই আত্মীয় পরিজন, ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না এদের। কিছুতেই না। এদের নিতে হলে আগে আমাকে নিতে হবে, আমারে ঘায়েল করতে হবে, এট্টা ব্যবস্থার ওলট-পালট করে ফেলে দিতে হবে প্রধান, তবে যদি পারে। জোর, জোর প্রতিরোধ প্রধান এবার। জোর প্রতিরোধ। জোর প্রতিরোধ।'

মনে রাখতে হবে, গণনাট্য সংঘের মঞ্চস্থ নাটকগুলিতে বিধৃত রয়েছে এদেশের গণআন্দোলনেরই ইতিহাস। ফ্যাসিবাদ বিরোধিতা, খাদ্যসংকট, মহামারী, প্রশাসনিক ব্যর্থতা ও দুর্নীতি, দাঙ্গা প্রতিরোধী সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অভিযান, তেভাগার লড়াই, জাতীয় মুক্তি আন্দোলন, দেশত্যাগের বেদনা, ছিন্নমূল জীবনের অসহায়তা, দুর্গতি, যন্ত্রণা, নতুনভাবে বাঁচার প্রত্যয়ে বলিষ্ঠ জীবন-সংগ্রাম—এ সবই ভাষা পেয়েছে গণনাট্যের নাটকে। জন্মলগ্ন থেকেই যে সংগ্রামী উত্তরাধিকার বহন করে চলেছে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, তার প্রমাণ শুধু 'নবান্ন' নাটক নয়, রয়েছে 'নবান্ন'-পরবর্তী নাট্যকারদের নাট্য প্রযোজনার মধ্যেও।

সাত.

সুতরাং 'নীলদর্পণ' থেকে 'নবান্ন'-এ আসতে চুরাশি বছর অতিবাহিত হলেও জনমানসে যেমন জাগ্রত হয়েছে নতুন জীবনবোধ, তেমনই একটি বিশিষ্ট রাজনৈতিক মতবাদের ভিত্তিতে বলিষ্ঠ জীবনদর্শনও। সংগ্রামী গণচেতনার উত্তরণের ফলে পুরো আমিনপুর গ্রামটাই এ-নাটকের নায়কত্ব অর্জন করেছে। সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের লড়াই এখানে অভীষ্ট লক্ষ্য। নীলদর্পণে বসু পরিবারের সঙ্গে তোরাপ-রাইচরণ-সাধুচরণরাও অবশ্য মিলে গিয়ে প্রতিরোধের ঐক্য গড়ে তুলেছিল। 'নীলদর্পণ'-এর নেপথ্যে বাংলার কৃষকদের নীল আন্দোলন ও সংগ্রামের ইতিবৃত্ত যেমন আছে, 'নবান্ন'-এ তেমনই মন্বন্তর ও মারীর কার্যকারণের সূত্রের ভিত্তিতে আমিনপুরের সাধারণ মানুষ ও কৃষক সমাজের প্রতিরোধের মিলিত প্রতিজ্ঞায় পরিপূর্ণতা। 'নবান্ন'-এ অবহেলিত, নিপীড়িত, দুঃস্থ গ্রামের মানুষ মঞ্চের শরিক হয়ে এল। সর্বোপরি রাজনৈতিক আন্দোলন, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর পটভূমিকায় গণজীবনের প্রতিচ্ছবিই এ-নাটকে প্রতিফলিত হয়নি, সংলাপে 'অকৃত্রিম স্বাভাবিকতা', 'নাটকীয় মনোলোগ', গ্রামীণ মানুষের মুখের সজীব ভাষা, দৃশ্যনির্মাণে অভিনবত্ব, পেশাদারি থিয়েটারের ভিত ভেঙে থিয়েটারে আন্দোলনের গুরুত্ব—বাস্তবধর্মী মঞ্চসজ্জা, চরিত্রচিত্রণ, অভিনয়ধারা সবই নতুন মাত্রা পেল 'নবান্ন' থেকে। এই অভিনব শিল্পরীতি 'নবান্ন'-কে দিয়েছে নতুনভাবে নাটক ও থিয়েটারকে দেখার বিশিষ্ট দর্শন।

'নীলদর্পণ' থেকে 'নবান্ন'-এ উত্তরণের এই চুরাশি বছরের ইতিহাস তাই সাধারণ গ্রামীণ মানুষ ও দুর্গত কৃষক সমাজের যন্ত্রণা ও সেই বেদনা-উত্তীর্ণ নতুন জীবনবোধের উদ্দীপ্ত স্মারক। 'মানুষের জন্য শিল্প' যদি সর্বতোভাবে স্বীকৃত সত্য হিসেবে প্রাধান্য পায়, তাহলে 'নবান্ন'-র এই ঐতিহাসিক দায়বদ্ধতাও প্রশ্নাতীত। শম্ভু মিত্রের সানন্দ স্বীকৃতিতে সে-কথা প্রমাণিত :

'আমরা সবাই জানি যে 'নবান্ন' ইতিহাস, নবান্ন মোড় ফেরানোর ফলক।'[২০]

তথ্যসূত্র :

১. ভূমিকা, নীলদর্পণ, দীনবন্ধু রচনাসংগ্রহ, প্রধান সম্পাদক : গোপাল হালদার, সাক্ষরতা প্রকাশন, পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৭৩।

২. যশোহর-খুলনার ইতিহাস, সতীশচন্দ্র মিত্র, ২য় খণ্ড পৃ. ৭৭৭।

৩. তদেব, পৃ. ৭৭৭।
৪. তদেব, পৃ. ৭৮১।
৫. উদ্ধৃতি, তদেব, পৃ. ৭৮৩।
৬. 'নীলদর্পণ', ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম : সুপ্রকাশ রায়, ডি এন বি এ ব্রাদার্স, দ্বিতীয় সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ৩৩১।
৭. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ : শিবনাথ শাস্ত্রী, নিউ এজ পাবলিশার্স,দ্বিতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ১৯৫৭, পৃ. ২০১।
৮. আমার কথা ও অন্যান্য রচনা : বিনোদিনী দাসী, সুবর্ণরেখা (পরিশোধিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ ১৩৭৬), পৃ. ১৯।
৯. 'নীলদর্পণ', নীল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ : প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্ত, র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ ১৯৭৮, পৃ. ১২৭।
১০. বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড : সমগ্র সাহিত্য, সাহিত্য সংসদ, চতুর্থ মুদ্রণ, বৈশাখ ১৩৭৬, পৃ. ৮৩৪-৩৫।
১১. 'পৌরাণিক নাটক' প্রবন্ধ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রঙ্গালয় পত্রিকা, ৩০ চৈত্র ১৩০৭।
১২. 'নীলদর্পণ নাটকের অভিনয়', বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮, পৃ. ৯৭-৯৮।
১৩. Marxist Cultural Movement in India (1936-1947), Edited by Sudhi Pradhan, National Book Agency, July 1979, Page 130.
১৪. Ibid, Page 131.
১৫. 'গণনাট্য : একটি মিথ' : কুমার রায় (অনুষ্টুপ, রজত জয়ন্তী বর্ষ, ১৯৯১, বিশেষ সংখ্যা, বাঙলার সংস্কৃতিতে মার্কসবাদী চেতনার ধারা, পৃ. ২২৪।
১৬. উদ্ধৃতি, 'নবান্নের স্মৃতি', গঙ্গাপদ বসু।
১৭. বহুরূপী; ৩৩। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় গৃহীত সাক্ষাৎকার ('নবান্ন' ও আজ, 'নবান্ন' স্মারক সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৬৯)।
১৮. 'গণনাট্যকথা : সজল রায়চৌধুরি, গণমন প্রকাশন, মে ১৯৯০, পৃ. ৪৯।
১৯. উদ্ধৃতি, 'নবান্ন', এপিক থিয়েটার, মে ১৯৭৭।
২০. শেষ সাক্ষাৎকার, সানন্দা, ৬ জুন, ১৯৯৭।